গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২ সংখ্যা ৮ আগস্ট ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

২৯ জুলাই ছাত্র ধর্মঘটে

রাজ্য জুড়ে ব্যাপক সাড়া

২৯ জুলাই পালিত হল সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই ডি এস ও'র ডাকা এই ছাত্র ধর্মঘট ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সর্বাত্মক। ধর্মঘটের সমর্থনে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসেনি, যারা এসেছিল দাবিগুলোর প্রতি সমর্থন জানিয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা থেকে তারা ফিরে গিয়েছে। রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। শিক্ষার সর্বস্তরে ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশান, মেডিক্যাল শিক্ষায় ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি ও ক্যাপিটেশন ফি চালু এবং শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে ও ভর্তি সমস্যা সমাধানের দাবিতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের আসন সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছিল এই ছাত্র ধর্মঘট। ছাত্র ধর্মঘটের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল হিন্দি ও উর্দু মাধ্যম ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ইংরাজির পরিবর্তে মাতৃভাষায় প্রশ্নপত্র করতে হবে। উপরোক্ত দাবিগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। স্কুলে প্রস্তাবিত বেতন চালুর বিরুদ্ধে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেছে, স্কুলে স্কুলে গড়ে উঠেছে শত শত ছাত্র কমিটি, ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মহকুমা শাসক, জেলা শাসক, স্কুল কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় বিক্ষোভ হয়েছে, ব্লক স্তরে বন্‌ধ হয়েছে, স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট, জেলা ভিত্তিক ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে। সরকার কর্ণপাত করেনি। বরং কয়েকদিন আগে বিধানসভায় স্কুল শিক্ষামন্ত্রী স্কুলে আবারও ফি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন, উচ্চশিক্ষামন্ত্রীও উচ্চশিক্ষার বেসরকারীকরণের পক্ষে সওয়াল করেছেন। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদের ভাষা মূর্ত রূপ পেল আধুনিক শিক্ষার প্রাণপুরুষ মহান বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে এই ছাত্র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে।

এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য একদিকে সরকার পুলিশ পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করেছে এ আই ডি এস ও সমর্থক-কর্মীদের, অন্যদিকে সরাসরি ধর্মঘট

সাতের পাতায় দেখুন

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশান ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে, সকল বেকারের কাজের দাবিতে, সাম্প্রদায়িকতা ও অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের প্রতারণার বিরুদ্ধে এবং ২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধের সমর্থনে

১৩ আগস্ট ছাত্র-যুব পদযাত্রা

হেদুয়া থেকে এসপ্ল্যানেড

জমায়েত — বেলা ১২টা

কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী লালসেলাম

আমাদের দল এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার সল্ট লেকে অবস্থিত ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যাণ্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন ৩ আগস্ট ২০০৩ সকাল ৭-০৭ মিনিটে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে (respiratory failure) শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর।

১৯৪৫ সালে দক্ষিণ কলকাতায় থাকাকালীন তিনি 'কালচার ক্লাবে'র মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন। 'কালচার ক্লাবে'র নানা কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ যে অবিশ্বাস্য প্রয়াস চালিয়েছিলেন, সেই প্রয়াসে প্রথম সারির যে ক'জন কর্মীকে তিনি শিক্ষিত ও যোগ্য করে গড়ে তোলেন, কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন তাঁদেরই একজন। রুচি-সংস্কৃতির উন্নত মান, সত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী হওয়া ছাড়া পার্টি প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্বের সেই কঠিন ও কঠোর সংগ্রামে অবিচল থাকা কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন সেই বিরল গুণের অধিকারী। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ চবিবশ পরগণার জয়নগরে এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা কনভেনশনে প্রতিনিধি রূপে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। যোগ্য পার্টি কর্মী হওয়ার সম্ভাবনা দেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ তৎকালীন বিহার রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড হীরেন সরকারের সহকারীরূপে কাজ করার জন্য তাঁকে ঘাটশিলায় পাঠান।

কমরেড চক্রবর্তী সুদীর্ঘ সময় ধরে ঘাটশিলাকে কেন্দ্র করে জামশেদপুর, নরসিংগড়, বহড়াগোড়া, মোসাবনী, পটকা, পটমদা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় খনিমজুর, চাষি, ছাত্র, যুবক এবং আদিবাসী শোষিত জনসাধারণের মধ্যে পড়ে থেকে পার্টি ও গণসংগঠন গড়ে তোলার জন্য কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন।

পরবর্তীকালে পার্টির নির্দেশে তাঁকে বিশেষ করে রেলশ্রমিক এবং অন্যান্য অংশের শোষিত জনসাধারণকেও সংগঠিত করার জন্য মুঙ্গেরে পাঠানো হয়। মুঙ্গেরের জামালপুরকে কেন্দ্র করে আশপাশের অঞ্চলগুলিতে ঘুরে ঘুরে সেখানেও তিনি পার্টি ও গণসংগঠন গড়ে তোলেন এবং রেলশ্রমিকদের মধ্যেও সংগঠন তৈরি করেন। ধীরে ধীরে মজঃফরপুর, আরা, ছাপরা, ধানবাদ, ডিগওয়াডি প্রভৃতি বিহারের অন্যান্য অঞ্চলেও তিনি সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে বিহারের রেলশ্রমিকদের মধ্যে তিনি উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন

আটের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ২৭তম স্মরণ দিবসে কলকাতার রানি রাসমণি রোডের বিশাল জনসভা। কমসোমলের সঙ্গে গার্ড-অব-অনার দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য সভার সভাপতি কমরেড অনিল সেন। ডানদিকে মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

গ্রাহক আন্দোলনের জয়
হাইকোর্টের রায়ে অভিন্ন বিদ্যুৎ মাশুল বাতিল হল

রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভুল ব্যাখ্যা করে গত নভেম্বর মাসে সি ই এস সি'র ২০০০-০১ এবং ২০০১-০২ সালের বিদ্যুৎ মাশুল অভিন্ন মাশুলনীতির ভিত্তিতে যথাক্রমে ৩৮০ ও ৩৯০ পয়সা ইউনিট ঘোষণা করলে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) ও রাজ্য সরকার সহ কয়েকটি সংগঠন তাকে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে চ্যালেঞ্জ করলে ১ আগস্ট বিচারপতি সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস তালুকদার তাঁদের রায়ে বলেন যে,

(১) ১৯৯৮ সালের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন অনুযায়ী বিভিন্ন কারণে মাশুলের পার্থক্য থাকতে পারে। কমিশন সুপ্রিমকোর্টের রায়ের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। ফলে আদালত ২৯(৩) ধারা অনুযায়ী মাশুলের পার্থক্য নির্ধারণের জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া দিয়েছে।

(২) অ্যাবেকার দাবি অনুযায়ী বিচারপতিদ্বয় বলেন যে, শুনানি না করে কমিশন মাশুল নির্ধারণ করে ঠিক করেনি, ফলে পুনরায় শুনানি করেই মাশুল নির্ধারণের নির্দেশ হয়েছে।

(৩) যতদিন না শুনানির ভিত্তিতে কমিশন নূতন করে মাশুল নির্ধারণ করছে ততদিন ডিভিশন বেঞ্চে র অন্তর্বর্তীকালীন রায় কার্যকরী থাকবে।

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছেন, "বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে। এটা প্রমাণ করেছে, রাজ্য সরকারের মদতে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন যে অভিন্ন মাশুল নীতি চালু করেছিল, তা সম্পূর্ণ বেআইনি ও গ্রাহক স্বার্থবিরোধী।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেন যে, এই রায়ের ফলে অভিন্ন মাশুল নীতি যে আইনসম্মত নয়, তা প্রমাণ হয়েছে। এ গ্রাহকদের জয়। কমিশনের উচিত হবে অবিলম্বে শুনানী করে নতুন করে মাশুল নির্ধারণ করে সি ই এস সি যে গ্রাহকদের কাছ থেকে আনুমানিক ১১২ কোটি টাকা বেশি আদায় করেছে, তা ফেরৎ দিতে বাধ্য করা। এই দাবিতে অ্যাবেকা আন্দোলনে নামছে।

জনগণের ঘাড় ভেঙে গোয়েঙ্কার থলি ভরে দিচ্ছে সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাকি বড়ই অর্থ সংকট! সংকট মেটাতে ওরা রাজ্যের গরিব জনসাধারণের উপর কর বসাচ্ছে ব্যাপকহারে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি কোনটাই বাদ যাচ্ছে না। বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি চলছে অবিরাম। সিকিউরিটি আদায়ের নামে চলছে সরকারি লুটপাট। এরই পাশাপাশি চলছে বৃহৎ শিল্পপতিদের উদার হস্তে সাহায্য বিতরণ। গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন সি ই এস সি'কে এইরকম সাহায্য দেওয়ার একটি ঘটনা সম্প্রতি ক্যাগ (CAG) রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি রিপোর্ট থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হল।

"বেসরকারি লাইসেন্সি সংস্থা সি ই এস সি লিমিটেড বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত। মে ১৯৬৫-এর চুক্তির শর্তানুযায়ী সরকার - অনুমোদিত দরে পর্ষদ (WBSEB) বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সি ই এস সি'কে।

জুন, ২০০২ অবধি সি ই এস সি'র কাছে পর্ষদের মোট বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৭৫০.৮৮ কোটি টাকা। এই বকেয়ার পরিমাণ পর্ষদের মোট বকেয়ার ৮১ শতাংশ। নথিপত্র পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিরীক্ষার নজরে আসে ঃ

(ক) প্রতি মাসের বিদ্যুৎ বিল মেটানোর সময় সি ই এস সি বিলের অঙ্ক নিয়ে অযথা আপত্তি তোলে, পর্ষদকে তার প্রাপ্য দেয় না এবং মাসের বিল থেকে কিছু টাকা বাদ দিয়ে রাখে। এর ফলে মোট বকেয়ার পরিমাণ নভেম্বর ১৯৯৫-এর ৫.৫৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০০০ অবধি ৭৮৩.৮২ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। এছাড়া 'লেট পেমেন্ট সারচার্জ' বাবদ আরও ১৮২.৮৮ কোটি টাকা ডিসেম্বর ২০০২ অবধি সি ই এস সি'র কাছ থেকে পর্ষদের পাওনা ছিল।

...সরকারের নিজস্ব আদেশবলে (ফেব্রুয়ারি ২০০১) পর্ষদের বকেয়া সি ই এস সি'কে মার্চ ২০০৬ এর মধ্যে মেটানোর সুযোগ দেওয়া হয় কোনরকম সুদ প্রদান ব্যতিরেকে (৭৫.০২ কোটি টাকা)। এছাড়া ১৯৯৯-২০০০ সালের বার্ষিক 'মিনিমাম চার্জ' বাবদ সি ই এস সি'র ১২.৪১ কোটি টাকার পরিশোধযোগ্য বকেয়াও সরকার মকুব করে দেয়। এছাড়া লেট পেমেন্ট সারচার্জ বাবদ সি ই এস সি'র কাছে পর্ষদের ১০৯.৭২ কোটি টাকা পাওনার ৬০ শতাংশ মকুব করে দেবার জন্য সরকার সম্মতি দিয়েছে। পর্ষদের আর্থিক স্বার্থের বিনিময়ে একটি বেসরকারি লাইসেন্সি সংস্থাকে সরকারের অনুচিত আনুকূল্য প্রদর্শন অযৌক্তিক।

.....সরকার কর্তৃক সি ই এস সি'কে অনুচিত আনুকূল্য প্রদর্শনের জন্য মোট ২০৪.৬৯ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে পর্ষদের।"

গ্রাহক সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে রাজ্য সরকারের এই গোয়েঙ্কাপ্রীতির কোন তুলনা হয়? (ভারতের মহাসচিব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন (CAG), বাণিজ্যিক, মার্চ ২০০২-এ সমাপ্ত বৎসরের জন্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃঃ ৮৩-৮৪)

এস ইউ সি আই পঞ্চায়েত প্রার্থীর উপর নৃশংস হামলা

সুজলা হালদার এবং তাঁর ১২ বছর বয়সী পুত্র সব্যসাচী হালদারকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়িতে চড়াও হয়ে সি পি এমের অশোক ওরফে খোকন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রায়দীঘি অঞ্চলের শ্রীফলতালা গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে গত ৩১ জুলাই।

তারা সুজলা ও সব্যসাচীকে চপার ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় উপর্যুপরি কোপ মারে। লোহার শাবল দিয়ে মেরে সুজলার দুই হাত ভেঙে দেয়, সব্যসাচীর পায়ে গুরুতর আঘাত করে। রক্তাক্ত অর্ধমৃত অবস্থায় প্রতিবেশীরা তাদের রায়দিঘী হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে তাদের স্থানান্তরিত করতে হয়। সুজলা হালদার গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই দলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী ছিলেন। সেই আক্রোশে গত ৩০-৭-০৩ সুজলার গাছ কাটে খোকন চক্রবর্তীরা। রায়দীঘি থানায় লিখিত আপত্তি (ডায়েরি নং ১৩৩২) জানানোর 'অপরাধে' সি পি এম সমাজবিরোধীরা ৩১ জুলাই সকালে এই বর্বরোচিত আক্রমণ করে। রায়দীঘি থানায় জানালে পুলিশ এফ আই আর নিতে অস্বীকার করে। পরে মন্দিরবাজার সি আই এবং ডায়মণ্ডহারবার এস ডি পি ও-র সাথে এস ইউ সি আই কর্মীরা সরাসরি দেখা করে রায়দীঘি থানার দুর্ব্যবহারের কথা বলায় এবং বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত রায়দীঘি থানা ও পুলিশের পক্ষপাতমূলক আচরণের বিরুদ্ধে উর্ধবতন কর্তৃপক্ষকে জানালে ৩১-৭-০৩ রাতে রায়দীঘি থানা এফ আই আর গ্রহণ করে। এই ঘটনায় এলাকায় প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ

অ্যাডিশনাল সিকিউরিটির প্রতিবাদে বহরমপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন

প্রবল দুর্যোগ উপেক্ষা করে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহরমপুরে সমবেত দু-শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক গত ৩০ জুলাই এস ই দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। খাগড়া নেতাজী মূর্তির পাদদেশ থেকে দাবি সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে সুসজ্জিত মিছিল দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে। খাগড়া বহরমপুরের মানুষ যেমন করে ১৯ জুলাই সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সর্বাত্মক বিদ্যুতের আলো বর্জন করেন; তেমনই গভীর উৎসাহে ঐদিন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে স্বাগত জানান। মিছিল জেলা শাসকের অফিস অতিক্রম করে বহরমপুর কোর্ট স্টেশন নিকটবর্তী এস ই দপ্তরে গেলে পুলিশ বাহিনী বাধা দেয় এবং ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না। গ্রাহকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লে ডেপুটেশনে যেতে দিতে বাধ্য হয়। আগাম জানান সত্ত্বেও এস ই অনুপস্থিত থাকেন। শেষপর্যন্ত এস ই (কমার্শিয়াল) প্রতিনিধিদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। দীর্ঘক্ষণ তর্কবিতর্কের পর বেলডাঙ্গা ও রাণীনগর থানার গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত 'ভুতুড়ে বিল' বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। অ্যাডিশনাল সিকিউরিটির প্রশ্নে এস ই কোন সদুত্তর দিতে পারেননি বলে জেলা সম্পাদক কুণাল বিশ্বাস জানান। বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার সহ ১৩ দফা দাবি নিয়ে জেলা সভাপতি বাণী ইসরাইল সহ রামগোপাল মণ্ডল, অজয় রায়, বাপী ঘোষ প্রমুখ প্রতিনিধিবৃন্দ ডেপুটেশনে অংশ নেন।

কাটোয়ায় জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

সরকারি স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদে ও সুচিকিৎসার দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি কাটোয়া মহকুমা শাখার উদ্যোগে মহকুমার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গত ২৬ জুলাই শ্রীখণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও ৩০ জুলাই কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য অধীক্ষকগণের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। শ্রীখণ্ডে মিছিল সহযোগে পাঁচ শতাধিক মানুষের স্বাক্ষর সহ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জনবিরোধী সরকারি স্বাস্থ্যনীতির পাশাপাশি হাসপাতালগুলির স্থানীয় সমস্যার প্রতিকারের দাবিও এই ডেপুটেশনে তোলা হয়। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রচার ও পথসভাও সংগঠিত হয়। পথসভাগুলিতে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য যুগল পাখিরা।

এই ডেপুটেশনগুলিতে যারা অংশ নেন তাদের মধ্যে ছিলেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক ডাঃ বিবেকানন্দ চৌধুরী, সুব্রত চৌধুরী, নন্দদুলাল দাস, গোপাল থান্দার, অশোক দাঁ, মহীতোষ কর্মকার, রাজকুমার চৌধুরী প্রমুখ।

স্বাস্থ্যনীতি ও চিকিৎসা শিল্পের বাজার প্রসঙ্গে

বিনা চিকিৎসায় শিশুমৃত্যু নিয়ে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে। এই উপলক্ষে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল কি দাঁড়িয়েছে তা দেখা যেতে পারে।

রাজ্যের চেহারাটা মুর্শিদাবাদের আয়নায় দেখলেই বোঝা যাবে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী জেলায় ৬৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে নবগ্রামে পলসন্ডায়, সামশেরগঞ্জে পুঁটিমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জঙ্গীপুরে গণকর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ভগবানগোলায় ওড়াহার, ডোমকলে গরিবপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ ২৪টায় ডাক্তার নেই। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৮৩২টির মধ্যে ২০০তে পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মী নেই। জেলায় ১৮টা ব্লক হাসপাতালের মধ্যে বেশিরভাগেই প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই বললে ভুল হবে — বলতে হয় নামমাত্র ডাক্তার-নার্স আছে। আধুনিক কিছু যন্ত্রপাতি এসেছে ৯টি গ্রামীণ ও তিনটি মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু তালা বন্ধ হয়ে আছে। আধুনিক অপারেশন রুম নেই। সদর হাসপাতালে ব্লাডব্যাঙ্ক নেই। ৩৭ হাজার শিশু পোলিও টীকা পায়নি। জেলা হাসপাতালে কিছুদিন আগে পর্যন্ত জলাতঙ্কের প্রতিষেধক ওষুধ ছিল না। তিন মাসে মারা গেছে অন্তত তিনজন। জেলার যক্ষ্মাকেন্দ্রে লাখ লাখ টাকার ওষুধ বিলি না হয়ে বাক্সবন্দী। কানুপুর, লালগোলার নসীপুর, ভগবানগোলা নসীপুর ব্লক কেন্দ্রে না আছে অক্সিজেন না আছে একটা প্রসূতি বিভাগ। এক্স-রে ব্যবস্থা নেই। লোহার খাট আছে, বিছানা নেই। ইসলামপুরে এক্স-রে মেসিন আছে — চলে না। ডোমকলে বিশ্বব্যাংকের টাকায় হাসপাতাল তৈরি হল। ছ'মাস পড়ে আছে। অপারেশন রুম বন্ধ। কান্দী হাসপাতালে একটা অপারেশন রুম, যন্ত্রপাতি তালাবন্ধ। কয়েক দিন আগে পর্যন্ত জেলা স্টোরে ওষুধ ছিল না। এর মধ্যে আবার চুরি-দুর্নীতি আছে। এবছর অডিটে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে তিন লাখ টাকার গরমিল ধরা পড়েছে। (বর্তমান, ১১ জুন, ২০০৩)

এমন অবস্থাই সারা রাজ্যে। যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার আছেন তাঁরা অনেকেই ঠিকায় নিযুক্ত। এর মধ্যে কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ ডাক্তারও আছেন। স্বাস্থ্যব্যবস্থার করুণ অবস্থা প্রকাশ পাওয়ার পর তাই স্থায়ী পদে ডাক্তার নিয়োগের কথাটা, আর শিশু-চিকিৎসায় অবহেলার জন্য ২/৩ জন ডাক্তারকে শাস্তির ঘোষণাটা এসে গেল সমস্যাটা চাপা দেওয়ার জন্য। এর কদিন পরেই ঘোষণা হল রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ইনডোর চিকিৎসার ব্যবস্থা উঠে যাবে। থাকবে শুধু আউটডোর! কলেরা, আন্ত্রিক রোগী অথবা সাপে কাটা, জলে ডোবা, বিষ খাওয়া রোগী অথবা একজন প্রসূতিকে এরপরও বাঁচতে হবে — স্রেফ সরকারি নীতিকে সেলাম জানানোর জন্য!

হাসপাতালে বছর বছর চার্জ বাড়ছে। পরীক্ষানিরীক্ষার খরচ বাড়ছে। ওষুধ তো প্রায় সবটাই ছাঁটাই তালিকায় গেছে। গত সাত বছরে এরাজ্যে একটাও স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাড়েনি। কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাড়ানো হবে না বলেই সরকারি সিদ্ধান্ত হয়েছে। অথচ এই সময়ে রাজ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে এক কোটি। সমস্ত হাসপাতালের মোট বেডের সংখ্যা বেড়েছে ৩০৩৮টি। প্রতি ১০ হাজারে ৩টি মাত্র! ঠিক হয়েছে পথ্যের জন্য চার্জ লাগবে।

এবারে স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ৫.১৬%। বরাদ্দ টাকার ৯৫% খরচ হয় বেতন, ঘর-বাড়ি মেরামত ইত্যাদিতে। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার জন্য ব্যয় হয় ৫%। স্বাস্থ্য পরিকল্পনা খাতে ১৪২.৬৯ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। ৭০১ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে ১৩% সুদে। উদ্দেশ্য নাকি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি করা! আর সেই উন্নতির ধাক্কায় হাসপাতালে পথ্য, ওষুধ, পরীক্ষানিরীক্ষায় চার্জ বসছে। আবার এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের অনেক কর্মসূচি তুলে দেওয়া হচ্ছে এন জি ও-দের হাতে। মানকুণ্ডু মানসিক হাসপাতাল, কলকাতা করপোরেশনের মাতৃ ও শিশুসদনগুলো তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কে এস রায় টিবি হাসপাতালের মতো ঐতিহ্যসম্পন্ন হাসপাতাল তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের হাতে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোও যে ভেঙে পড়েছে তা অকারণ নয়। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০২-তে অন্তত মুখে জোর দেওয়া হয়েছে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থার ওপর। বলা হচ্ছে বরাদ্দের ৫০% অর্থব্যয় করতে হবে এই খাতে। পরের ধাপে ১২০০ কোটি টাকা বিদেশি ঋণ নেওয়া হচ্ছে। তার শর্ত অনুযায়ী গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থাটা তুলে দেবে বেসরকারি হাতে। অর্থাৎ শহর ও গ্রাম এলাকায় সরকারি চিকিৎসার ভগ্নদশার শূন্যতাকে ভরাট করে তুলবে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসা। ইতিমধ্যেই প্রধান প্রধান দৈনিক-গুলোতে একটা নতুন শব্দ এসেছে — তার নাম চিকিৎসাশিল্প। আম-জনতা স্বাস্থ্যপরিষেবার বেহাল দশা নিয়ে সরকারকে যতই গালি দিক, কংগ্রেস সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিকে কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার যেভাবে রূপ দিতে চাইছে রাজ্য সরকার তার স্বাস্থ্যনীতিকে সেই মতই ঢেলে সাজাচ্ছে। এজন্যেই বামফ্রন্টের ২০ বছরের সাফল্যের খতিয়ানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলতে পেরেছেন ঃ চিকিৎসার ব্যাপারে রাজ্যের জনগণকে আমরা সরকার মুখাপেক্ষী করে রাখিনি। এই সাফল্যের সাথেই ঠিকায় ডাক্তার, দুই-তৃতীয়াংশ ইনডোর তুলে দেওয়া, স্বাস্থ্যবাজেট ছাঁটাই করা সহ যাবতীয় জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

মানুষ তো বাঁচবার জন্যই হাসপাতালে যায়। গ্রাম ও শহরে যদি সত্যিই সরকারি হাসপাতালে গিয়ে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয় তবে সেখানে মানুষ যাবে কেন? কার মুখের দিকে সে তাকাবে? সরকারের দিক থেকে জনগণের চোখটা তাই ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটু একটু করে। অসহায় মানুষ অনেক বঞ্চনা, অনেক শিশু-মা-ভাইকে হারিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আছড়ে পড়বে চিকিৎসার ব্যবসায়ীদের দোরগোড়ায়। সরকারি হাসপাতাল থাকবে যেন ভিক্ষের চাল। তার আবার কাঁড়া আকাঁড়া কি ? প্রশ্ন তোলাই পাগলামী।

সে কারণেই স্বাস্থ্য নিয়ে এক জমকালো আলোচনা হয়ে গেল শিল্পপতিদের সভায়। বণিক সভা অ্যাসোচেম আয়োজন করেছিল আলোচনা সভা। সেই সভায় ওয়েস্টব্যাঙ্ক হাসপাতালের ডিরেক্টর শতদল সাহা বললেন, রেটিং পদ্ধতিতে 'চিকিৎসা-শিল্পে' শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। এখন চিকিৎসা তাহলে শিল্প? এজন্যই বণিকসভার এজেন্ডা! এবার বলি 'রেটিং' জিনিসটা কি। ইক্রা হল একটা রেটিং সংস্থা। এই ইক্রার চেয়ারম্যান ধ্রুবনারায়ণ ঘোষের ধারণাটা শোনা যাক। রেটিং ব্যবস্থা যেমন ঋণপত্রের বাজারে মান প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল তেমনই 'চিকিৎসা-শিল্পে'ও সাহায্য করবে। হাসপাতালের প্রযুক্তি, পরিকাঠামোগত উৎকর্ষতা, সামগ্রিক ব্যবস্থা, মানবসম্পদ পরিচালনার ক্ষমতা, তার আর্থিক বল, নার্স ও ডাক্তারদের মান ও যোগ্যতা, চিকিৎসার পদ্ধতি, রোগীদের অভিজ্ঞতা, এবং ঐ চিকিৎসা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অতীত রেকর্ডকে ভিত্তি করে রেটিং নির্ণয় হবে। ঋণপত্রে বিনিয়োগের সুরক্ষায় যেমন তথ্য প্রয়োজন হয়, চিকিৎসা শিল্পে কোথায় পুঁজি ঢাললে মুনাফা সুনিশ্চিত হবে তার হদিশ রেটিং মারফৎ জানা যাবে। রোগীও জানতে পারবে কোন চিকিৎসা শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসা নামের পণ্যটি তিনি কিনবেন। চিকিৎসা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর চারটে গ্রেড থাকবে। গ্রেড ওয়ান — অতি উচ্চমান, গ্রেড টু — উচ্চমান, গ্রেড থ্রি — মাঝারি ও গ্রেড ফোর — নিম্নমান। কেমন চিকিৎসা পণ্যটি কেনা যাবে তা নির্ভর করবে কেমন পয়সা বা ক্রয়ক্ষমতা আছে তার উপর। বণিক সভার আলোচনায় জানা যায় চিকিৎসা শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রচুর। কারণ ঃ দেশে চিকিৎসাপ্রার্থীর তুলনায় চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতান্তই কম। মানেটা দাঁড়ায় চিকিৎসা শিল্পের বাজারে চাহিদা বিরাট। যোগান কম।

আলোচনায় আরও প্রকাশ পেল যে গত দশ বছরে এ দেশে শহরগুলিতে বড় মাপের বিনিয়োগ হয়েছে। আগামী দশ বছরে আরও সাড়ে সাত লাখ শয্যার চিকিৎসা শিল্প প্রতিষ্ঠান নানা এলাকায় গড়ে তোলা হবে। সেই শিল্পে অন্তত দেড় লাখ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিযুক্ত হবে। এমন অবস্থায় বিত্তবানদের চিকিৎসা কিনবার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ডাক্তার নামক পণ্যটি এত সংখ্যায় কোথা থেকে আসবে ? তারও একটা বাজার তৈরি হচ্ছে বলে ডাক্তার তৈরির কারখানা চাই। সেখানে পুঁজি ঢালা যাবে। একারণেই সরকার নিজের কলেজগুলোকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দাঁড় করাচ্ছে আবার প্রাইভেট মেডি-ক্যাল কলেজও তৈরি করার অনুমোদন দিচ্ছে। প্রয়োজন মত আইনকানুনও সংশোধন হচ্ছে এ কারণেই। ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিনকে এজন্যই অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যাই হোক, এই শিল্পের বাজার কেমন — তা সার্ভে করার কাজটি কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকার মিলেই করেছে। কোন্ জেলায় কোন্ রোগের প্রাবল্য, কোন্ কোন্ ধরনের রোগীর শতকরা হার কি, তাদের সামাজিক আর্থিক অবস্থান কিরকম তা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

ঐ সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছেন —"সরকারের পক্ষে সারা রাজ্যে এত রোগীর দায় নেওয়া সম্ভব নয়। সাহায্য প্রয়োজন।" বলা বাহুল্য এই সাহায্য মানে বেসরকারি পুঁজি। বরাবরের মত সূর্যবাবু আলোচনায় মৃত্যুর মোট সংখ্যার অনুপাতে মাতৃত্বজনিত কারণ, শিশুমৃত্যু সংখ্যা বাদ দিয়ে বলেছেন, এই হার ৫%। তবে সেক্ষেত্রে অপুষ্টিই একটা প্রধান কারণ। এ ব্যাপারে চিকিৎসার কিছু নেই। ক্রয়ক্ষমতাহীন দারিদ্র্যসীমার নিচে ৭০% মানুষকে বাদ দিলে ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের চিকিৎসার বাজারটি হিসাব করে পুঁজি বিনিয়োগ ও মুনাফার সম্ভাবনা সূর্যবাবুরাও দেখতে পাচ্ছেন। কারণ তাঁরা জানেন এ পণ্য বাজারে কাটতি হবেই। কারণ সেই কথাটাই ঃ মানুষ বাঁচতে চায়। অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে যে ঝামেলা আছে বাজারসংকটের ঝুঁকি আছে — চিকিৎসা শিল্পের বাজারটা আর যাই হোক তত ঝুঁকিপূর্ণ নয় মোটেই। ঝুঁকি যদি থাকে তা রোগীর বা ক্রেতার, বিনিয়োগকারীর নয়। তাই ব্লক-উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্তর পর্যন্ত চিকিৎসা শিল্পের জালে বাঁধা পড়তে হবে গ্রামবাংলার গরিবকে। এমন এক অবস্থায় বলতে হয় সম্প্রতি হাসপাতালে অবাঞ্ছিত মৃত্যু মিছিল নিতান্তই কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের করুণ পরিণাম — যা গণহত্যার নামান্তর নয় কি? পুঁজিপতিশ্রেণীর এই ভয়াবহ আক্রমণ যা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মারফৎ আম জনতার বুকে নেমে এসেছে তাতে — চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বললেই বাঁচা যাবে কি ?

আর একটা কথাও বলা দরকার। হয় কথায় নয় কথায় ডাক্তারবাবুদের হেনস্থা করা হচ্ছে, সরকার তার মতলবকে আড়াল দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে ডাক্তারদের দোষী সাব্যস্ত করে। অসহায় রোগীরা ও তাদের আত্মীয়স্বজন চিকিৎসা ও মানবিক ব্যবহার না পেয়ে ডাক্তারবাবুদের ওপর চড়াও হন। ডাক্তারদের সম্পর্কে রোগীদের মধ্যে, জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি করা হচ্ছে। নিকৃষ্ট এক চিকিৎসা পরিকাঠামোর মধ্যে উৎকৃষ্ট সেবা দাবি করলে তা কি যুক্তিসংগত হয়? রোগী ও ডাক্তারদের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক ও লেনদেন এবং ভরসা বিশ্বাসের ক্ষেত্রটাকে সরকার সুকৌশলে ভেঙে দিচ্ছে। আর যে লক্ষ্যে সরকার এগুচ্ছে তার পরিপূরক পদক্ষেপ হিসাবে উপরে আলোচিত পটভূমিতে চিকিৎসা শিল্পের ক্রেতা-বিক্রেতা সম্বন্ধ ডাক্তার-রোগীকে শৃঙ্খলিত করছে ক্রেতা সুরক্ষা আইনের মায়াজালে। সরকারের কাছে জনগণের চিকিৎসার মানবিক দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা ক্রমাগত কমছে বলেই চিকিৎসকেরা গুরুত্ব ও সম্মান হারাচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে ডাক্তার তৈরির কারখানা, মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে গ্যাঁটের পয়সা খরচ বা বিনিয়োগ করে যে ডাক্তারকুল জন্ম নেবে তারাও খরচা উসুল করার জন্য ডাক্তারি নৈতিকতা বর্জিত ব্যবসাদার হিসাবেই গড়ে উঠবে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে মানুষে মানুষে যতটুকু সামাজিকস্বার্থের সম্বন্ধ একসময় ছিল তার অবশেষটুকুও আজ হারিয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী মুনাফার বর্বর বাস্তবতা বাজার সংকটের বেনজির যুগে আজ উলঙ্গ হয়ে পড়েছে। ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন যথেষ্টসংখ্যক ক্রেতার অভাবে আজ ডাক্তার নামের পণ্য ও পুঁজিবাদের উদ্বৃত্ত পণ্য এবং তা গুদামজাত হয়ে যাচ্ছে। মানে বেকার হয়ে যাচ্ছে। এর বদল চাইলে জেহাদ চাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে।

এই পটভূমিতেআজ থেকে দেড়শ বছর আগে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা কমিউনিস্ট ইসতেহারের কয়েকটা কথা স্মরণ করা যেতে পারে ঃ *"বুর্জোয়াশ্রেণী নানারকমের সামন্তী সম্পর্কগুলিকে নির্দয়ভাবে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। ... এব) মানুষের সঙ্গে মানুষের একটি মাত্র সম্পর্ককেই শুধু তারা বাঁচিয়ে রাখছে, তা হচ্ছে — নগ্ন ব্যক্তিস্বার্থ, নিস্পৃহ নগদ বিদায়।... ব্যক্তিগত গুণাবলীকে তারা নামিয়ে এনেছে বিনিময়মূল্যে ক্রয়যোগ্য পণ্যের স্তরে। এককথায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মোহজালে আড়াল করা শোষণকে হটিয়ে দিয়ে তারা কায়েম করেছে নগ্ন, নির্লজ্জ প্রত্যক্ষ, বর্বর, শোষণ ... এতদিন যে সব পেশাকে মানুষ সমীহ করেছে, সম্মান করেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী সেইসব পেশার মর্যাদার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। চিকিৎসক, আইনজীবী, যাজক, কবি,*

সাতের পাতায় দেখুন

ফি-বৃদ্ধির ওকালতি করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের দোহাই দিতেও মন্ত্রীদের আটকাচ্ছে না

কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকারের শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের নীতির বিরোধিতার মুখোশ পরেই এ রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারি নীতিকেই কার্যকর করে চলেছে। তাদের এই দ্বিচারিতা এ রাজ্যের মানুষকে হতবাক করেছে। একদিকে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার বলছে যে, তারা শিক্ষার বেসরকারীকরণের ও বাণিজ্যিকীকরণের বিরোধী। আবার একই সাথে তারা প্রচুর ভর্তি ফি নিয়ে হাজার হাজার টাকার মাসিক বেতনের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খুলছে, মেডিক্যালে ছাত্র প্রতি ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ১৫ শতাংশ আসন বিক্রি করছে। মেডিক্যাল শিক্ষার বেতন ৫০ গুণের মত বাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা বেসরকারি পুঁজিকে শিক্ষাক্ষেত্রে আহবান জানাচ্ছে, চালু করছে 'সেলফ

২৯ জুলাই। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ

ফিনান্সিং' কলেজ। কলেজগুলিকে ইতিমধ্যেই নিজেদের খরচ নিজেদের তোলার জন্য তারা পরামর্শ দিয়েছে। পরিণতিতে বাড়ছে কলেজের বেতন, চালু হচ্ছে ডোনেশন প্রথা। সম্প্রতি শিক্ষার বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করে এ রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরের হাফ ডজন মন্ত্রীর দুইজন কান্তি বিশ্বাস ও সত্যসাধন চক্রবর্তী স্কুল স্তরেও ব্যাপক ফি-বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় ছাত্রছাত্রীরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে। বিভিন্ন জায়গায় সভা, মিছিল, পথ-অবরোধ, অবস্থান ইত্যাদি কর্মসূচিতে এবং স্থানীয় স্তরে বন্ধ, ধর্মঘটের মাধ্যমে এই আন্দোলনে ব্যাপক ছাত্রছাত্রীরা সামিল হচ্ছে। অভিভাবকরাও এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। স্থানীয় স্তরে কিছু কিছু দাবিও আদায় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য হল রাজ্য সরকার প্রথমে মেডিক্যালের বেতন ১০০০ টাকা হবে বলে ঘোষণা করলেও আন্দোলনের চাপে ইতিমধ্যেই তা কমিয়ে ৮৫০ টাকা হবে বলে ঘোষণা করেছে, কিন্তু আন্দোলন তীব্রতর হওয়ায় ফি আরও কমতে যাচ্ছে। শিক্ষার ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে ক্রমাগত গতিবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে। গত ২৯ জুলাই রাজ্যব্যাপী সফল ছাত্র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তা প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষার বাজেট বিতর্কে এস ইউ সি আই দলের পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের একটির পর একটি প্রশ্নের উত্তরে দুই শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন — তা এককথায় সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী চরিত্রকেই অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিয়েছে। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেছেন, '১৯৯২ সালে এই ফি ধার্য করা হয়েছিল। এরপর এগারো বছর কেটে গিয়েছে। ফলে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত টিউশন ফি না বাড়লেও বাকি সব রকমের ফি বাড়বে।' মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রন্টের শরিকদলও প্রশ্ন তুলেছে যে, 'বাহাদুরি নেওয়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আমরা শিক্ষাকে অবৈতনিক করলাম। বাহবা কুড়োলাম। এখন এ কী ধরনের আচরণ?'

আমরা সকলেই জানি, সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করে 'অসাধারণ কিছু একটা কাজ করেছে' — এরকম একটা প্রচার তোলার চেষ্টা করেছিল। কেউ কেউ তার দ্বারা তখন প্রভাবিতও হন সাময়িকভাবে। কিন্তু অচিরেই সরকারের আসল চরিত্রটি ধরা পড়ে যায়। তারা 'বেতন' বা 'টিউশন ফি' না নিলেও 'ডেভেলপমেন্ট ফি' নামে গ্রামে এবং শহরে একটা ফি ধার্য করে — যা বেতনের তুলনায় কম তো নয়ই বরং বেশি। অপরদিকে সরকার স্কুলের অনুদান এবং তার পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য অর্থবরাদ্দ ব্যাপকহারে কমিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে স্কুলগুলির স্বাভাবিক কাজকর্ম প্রবলভাবে ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় স্কুলের কাজ ঠিকমত চালু রাখার জন্য বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ডেভেলপমেন্ট ফি'র সঙ্গে একটা ভাল পরিমাণ টাকা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে দাবি করতে থাকে। একদিকে ভর্তি হওয়ার সমস্যা, অপরদিকে ভর্তির সুযোগ পেতে স্বনামে-বেনামে বিরাট অঙ্কের ডোনেশন — সব মিলিয়ে এক দুর্বিষহ অবস্থা। বহু ক্ষেত্রে স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সঙ্গে

২৯ জুলাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র-অভিভাবকদের বিরোধ বেধে যায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকরা স্কুলের জন্য অনুদান না পেয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চাইছেন, আর সেই অর্থ দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় ভর্তির সুযোগ থেকে বিরাট অংশের ছাত্রছাত্রী বঞ্চিত হচ্ছে। সরকার এই বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে — বার বার আবেদন জানিয়েও কোন ফল হচ্ছে না।

এবারের বাজেট বিতর্কের সময় স্কুল শিক্ষামন্ত্রী হুংকার ছেড়ে বলেছেন, 'যারা সরকার নির্ধারিত ফি'র বেশি নিচ্ছে, তাদের অনুমোদন বাতিল করা হবে।' প্রশ্ন হ'ল, সরকার কি এসব জানেন না? অনুদান বন্ধ করে অথবা কমিয়ে স্কুলগুলিকে অর্থসঙ্কটের মধ্যে ফেলে এবং তারই সাথে ছাত্রদের কাছ থেকে খরচ তোলার পরামর্শ দিয়ে কি কান্তিবাবুরাই 'ডোনেশন প্রথা' চালু করতে সাহায্য করেননি? এর আগে জেলায় জেলায় ছাত্র সংগঠন সারা ভারত ডি এস ও'র পক্ষ থেকে এইসব স্কুলের তালিকা দেওয়া হয়েছে, বিধানসভায় কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এইসব স্কুলের একটা তালিকা এবারও দিয়েছেন কান্তিবাবুকে, তবু কোন প্রতিকার হয়নি। অবস্থা পূর্ববৎ রয়েছে। ফলে মন্ত্রীর হুংকার যে একটি ফাঁকা আওয়াজ, একথা বুঝতে কারুরই অসুবিধা নেই।

ফি-বৃদ্ধির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিধানসভায় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া ভাষণটিও তাদের আসল চরিত্র প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। তাঁর বাজেট বিতর্কের ভাষণ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, তিনি বা তাঁর দল পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে বেসরকারীকরণের পথেই হাঁটতে চান। তাই ৪২টি বেসরকারি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও আইন কলেজের প্রস্তাব করে, 'সেলফ ফিনান্সিং' কলেজে বিপুল টাকার বিনিময়ে মাইক্রোবায়োলজি, সীড টেকনোলজি, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার সায়েন্স পড়ানোর ব্যবসার অনুমতি দিয়ে, কলেজগুলির অনুদান বন্ধ করে যেমন তেমন করে ছাত্রদের উপর হরেকরকম ফি-এর বোঝা চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বনাশা নীতি অনুসরণ করেও প্রবল চিৎকারে স্লোগান দিতে পারেন যে, তাঁরা

২৯ জুলাই। যোগমায়া দেবী কলেজ

কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার বেসরকারীকরণের নীতির বিরুদ্ধে। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের এই দ্বিচারিতাপূর্ণ আচরণে সি পি এম কর্মীদের একটা বিরাট অংশের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ এবং দল সম্পর্কে অনাস্থা দেখা দিচ্ছে — তাঁরা অনেকেই বিস্মিত বিমূঢ়।

লজ্জার কথা, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সামান্যতম চক্ষুলজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে ফি-বৃদ্ধির সাফাই গাইছেন বিদ্যাসাগরের নাম উচ্চারণ করে। তিনি বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিষ্ঠানে সেই সময়ে যে ফি ধার্য করেছিলেন, আজকের হিসাবে তা প্রায় ৩০০ টাকা। তার জায়গায় সরকার ফি ধার্য করেছে ৫০ টাকা।' মন্ত্রীমহোদয় বোধহয় বিস্মৃত হয়েছেন অথবা জেনেশুনেই চেপে গিয়েছেন যে, বিদ্যাসাগর নীতিগতভাবে মনে করতেন, 'সরকারকেই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হবে'। এজন্য তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে এবং তদানীন্তন 'বড়লাটের' কাছে বারবার দাবি করেছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক তাঁর দাবি মেনে নেয়নি। অথচ এদেশের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক। সেই কারণে বাধ্য হয়ে নিজের অর্থ দিয়ে, দুয়ারে দুয়ারে অর্থসংগ্রহ করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং সেই সময়ে অন্যান্য স্কুলের তুলনায় সেই স্কুলের বেতন ছিল সবচেয়ে কম। সত্যসাধনবাবুরা কি সেই সংগ্রাম এতটুকুও করেছেন? নাকি, জনসাধারণের রক্ত জল করা ট্যাক্সের টাকায় শিক্ষাদপ্তরে হাফডজন মন্ত্রী পুষে তাঁদের পেছনে অবিরাম টাকা ঢেলে নিজেরা ফুলে ফেঁপে উঠেছেন! শুধু তাই নয়, বর্তমানে সরকারে থেকে শিক্ষার ব্যয়ভার পুরোপুরি বহন করতে অস্বীকার করছেন সত্যসাধনবাবুরা। ইতিহাসের তুলনামূলক বিচারে সত্যসাধনবাবুরাই কার্যত নিয়েছেন ব্রিটিশ শাসকের ভূমিকা, অথচ ভাবখানা দেখাতে চাইছেন যেন তাঁরা বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরী। সি পি এম দল যে আনন্দবাজার পত্রিকাকে মুখে খুবই সমালোচনা করে থাকেন, শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সেই পত্রিকাটির সম্পাদকীয় সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করে বলেছে, 'উচ্চশিক্ষা তাঁহারাই পাইবেন, যাঁহারা সত্যই সেই শিক্ষা লইতে চাহেন এবং যাঁহারা সেই শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে সক্ষম'। আর শিক্ষাপ্রসারের অন্যতম পুরোধা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —

ছয়ের পাতায় দেখুন

জর্জ বুশ-এর ভিয়েতনাম

জন পিলজার

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত আমেরিকার দুটি "মহাবিজয়"-এর স্বরূপ উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। আফগানিস্তানে হামিদ কারজাই-এর শাসনের বাস্তবে কোন কর্তৃত্ব বা অর্থ সম্পদ নেই এবং আমেরিকার বন্দুক ছাড়া তা টিকবে না। আল কায়দা পরাস্ত হয়নি এবং তালিবানরা আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। লোকদেখানো কিছু উন্নতি ছাড়া, মহিলা ও শিশুরা শোচনীয় অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে। স্থায়িত্ব এসেছে এটা জাহির করার জন্য আমেরিকা যাদের হাতে লক্ষ লক্ষ ডলার উপঢৌকন তুলে দিয়েছিল, সেইসব যুদ্ধবাজদের প্রাইভেট আর্মি নির্বিচারে খুন, ধর্ষণ ও শিশু নির্যাতন করে চলেছে।

কাবুলের কাছে বাগরাম বিমানঘাঁটিতে একজন আমেরিকান কর্ণেল আমাকে বলল — যে মুহূর্তে এই ঘাঁটি ছাড়ব, আমরা গিয়ে পড়ব এক যুদ্ধক্ষেত্রে; প্রতিদিন এবং দিনে একাধিকবার আমাদের ওপর গোলাগুলি চলছে।" যখন আমি বললাম যে, তারা অবশ্যই জনগণকে মুক্ত করতে ও সুরক্ষা দিতেই এসেছে, কর্ণেল অট্টহাস্য করে উঠল।

আমেরিকান সৈন্যদের আফগানিস্তানের শহরগুলিতে প্রায় দেখাই যায় না। তারা উচ্চপদস্থ মার্কিন অফিসারদের পাহারা দিয়ে কালো জানালাওয়ালা সশস্ত্র গাড়িতে বা সামরিক গাড়িতে সামনে-পিছনে মেশিনগান উঁচিয়ে তীব্র গতিতে যাতায়াত করে। এমনকি প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামস্ফেল্ডের সাম্প্রতিক ঝটিকাসফরেও বিস্তীর্ণ বাগরাম ঘাঁটিকে নিরাপদ বলে মনে করা হয়নি। মার্কিনীরা এতটাই ভীত যে কয়েক সপ্তাহ আগে কাবুলের কেন্দ্রস্থলে তারা "ভুল করে" চারজন সরকারি সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করে; এর ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার তাদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে কাবুলের রাস্তায় বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বেরোয়।

আমার কাবুল থেকে ফিরে আসার দিন বিমানবন্দরের রাস্তায় একটি গাড়িবোমার বিস্ফোরণ ঘটে; তাতে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনী ইসাফের সদস্য চারজন জার্মান সৈন্যের মৃত্যু ঘটে। জার্মান বাসটি শূন্যে উড়ে যায়, মানুষের দেহাবশেষ রাস্তার ধারে ছড়িয়ে পড়ে থাকে। যখন ব্রিটিশ সৈন্যরা এলাকাটা 'সিল' করে দিতে উপস্থিত হল এক বিরাট জনতা খানিকটা দূরে রাস্তার অপর পাশে প্রচণ্ড গরম আর ধুলোর মধ্যে নীরবে তির্যক দৃষ্টিতে তাদের দেখতে লাগল। দু'পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ঠিক ততটাই ছিল যা ১৯ শতকে ব্রিটিশ সৈন্যদের আফগানদের থেকে, আলজিরীয়দের থেকে ফরাসীদের বা ভিয়েতনামীদের থেকে মার্কিন সৈন্যদের আলাদা করে রাখত।

দ্বিতীয় 'বিরাট বিজয়'-এর অকুস্থল হল ইরাক। আজ দুটি সত্য সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রথমটা হল, যে "সন্ত্রাসবাদীরা" আজ মার্কিন দখলদারবাহিনীকে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে তারা কিন্তু এক সশস্ত্র প্রতিরোধকেই তুলে ধরছে এবং একথা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরাকিদের সমর্থন পাচ্ছে। অর্থাৎ যুদ্ধের আগে যে প্রচার করা হয়েছিল ছবিটা তার ঠিক উল্টো — বেশিরভাগ ইরাকি তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া 'মুক্তি'র বিরুদ্ধে (এই প্রসঙ্গে guardian. co.net-তে ১৯ মার্চ ২০০৩, প্রচারিত জোনাথন স্টিলের তদন্তের বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় সত্যটা হল, ইঙ্গ-মার্কিনীরা কি হারে গণহত্যা করেছে তার প্রমাণ বেশি বেশি করে প্রকাশ্যে আসছে। এইগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, যে রক্তস্নানের কথা বুশ ও ব্লেয়ার বরাবর অস্বীকার করে এসেছে, তা সত্যিই ঘটেছিল।

ভিয়েতনামের উদাহরণের সাথে ইরাকের যুদ্ধকে এতবার এত লোকে তুলনা করেছে যে আমি আর তা করতে চাইছি না। শুধু বলতে চাই, সাদৃশ্যগুলো চোখে পড়ার মত। যেমন 'কাদায় পা বসে গিয়েছে' — এই লব্‌জ্‌টা নতুন করে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। আগের মতই, ভাবখানা হল, মার্কিনীরা আক্রমণকারী নয়। অবস্থার শিকার। একটা লুণ্ঠন অভিযান বেকায়দায় পড়লে তাকে কিভাবে দেখানো হবে — এ হল তার হলিউড মার্কা উদাহরণ। প্রায় মাসতিনেক আগে সাদ্দাম হোসেনের 'স্ট্যাচু' উপড়ে ফেলা হয়েছিল, তারপর থেকে যত মার্কিন সৈন্য মরেছে, যুদ্ধের সময় তত মরেনি। রাস্তা অবরোধ করে বা চেকপয়েন্টে গেরিলা আক্রমণে ১০ জন মার্কিন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছে; একদিনে এ ধরনের এক ডজন আক্রমণ পর্যন্ত হচ্ছে। (পিলজার-এর লেখাটা ২২ জুনের, এ সংখ্যা আরও বেড়েছে — স.গ.)

মার্কিনীরা ভিয়েতনামীদের যেভাবে 'কমিউনিস্ট' আখ্যা দিয়ে তাচ্ছিল্য করত, এখানেও সেইভাবে ইরাকি গেরিলাদের "সাদ্দাম অনুচর" ও "বাথপন্থী" বলে দেখাচ্ছে। সম্প্রতি ইরাকের সুন্নি অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত ফালুজায় যেখানে কোন বাথপন্থী বা সাদ্দামপন্থী আদপেই নেই, সেখানে স্রেফ দখলদাররা নির্মম-ভাবে জনতার ওপর সরাসরি গুলি চালানোয় প্রতিরোধের জন্ম হয়েছে। মার্কিন ট্যাঙ্ক থেকে গুলি চালিয়ে একটি মেষপালক পরিবারকে হত্যা করার ঘটনা, চারবছর আগের আর এক হত্যাকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে 'নো-ফ্লাই জোন' (বিমান উড়ান নিষিদ্ধ অঞ্চল) -এর মধ্যেই জোটবাহিনীর বিমান থেকে গুলি চালিয়ে এক মেষপালক, তার পরিবার এমনকি ভেড়াগুলোকে হত্যা করা হয়েছিল। আমি এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার একটা চলচ্চিত্র তুলেছিলাম এবং এই ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর মারণ খেলার কথা। তারা সেখানে ক্ষেতেকর্মরত চাষি বা মোষের পিঠে চড়া শিশুদের বিমান থেকে খেলাচ্ছলে গুলি চালিয়ে হত্যা করত।

এক মার্কিন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, ১২ জুন এক বিরাট মার্কিন বাহিনী বাগদাদের উত্তরে একটি 'সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি' আক্রমণ করলে ১০০ জনেরও বেশি ইরাকির মৃত্যু হয়। এখানে 'সন্ত্রাসবাদী' কথাটা গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটা প্রয়োগ করে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে 'মুক্তিদাতা'দের আক্রমণ করছে আল কায়দার মত শক্তিরা। এইভাবে ইরাকের সাথে ১১ সেপ্টেম্বরকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রচারের এই ধরনটা নতুন, যুদ্ধের আগেও এ ধরনের প্রচার করা হয়নি।

এই অভিযানে শ'চারেক ইরাকিকে বন্দী করা হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে তাদের বেশিরভাগকেই বাগদাদ বিমান বন্দরে অবস্থিত এক অস্থায়ী কারাগারে (এর নাম দেওয়া হয়েছে হোল্ডিং ফেসিলিটি) আরও হাজার হাজার ইরাকির সাথে রাখা হয়েছিল। এটা আর কিছুই নয়, আফগানিস্তানের বাগরামের ধাঁচের এক 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প', যেখান থেকে বন্দীদের গুয়ানতানামো উপসাগরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আফগানিস্তানে মার্কিনীরা ট্যাক্সিচালকদের তুলে নিয়ে গিয়ে বাগরাম মারফৎ লোপাট করে দেয়। যেমন করে চিলির পিনোচেট এবং তার দলবল কাউকে শত্রু মনে করলেই লোপাট করে দিত।

'খুঁজে বার কর আর ধ্বংস কর', ভিয়েতনামে ব্যবহৃত এই পোড়ামাটি নীতি আবার ফিরে এসেছে। আফগানিস্তানের শুখা অঞ্চল দক্ষিণপূর্ব সমভূমিতে নিয়াজিকালা গ্রামের আর অস্তিত্ব নেই। মার্কিন বায়ুসেনার দল ২০০১ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভোরের সময় এখানে নেমে অন্যান্য-দের সাথে একটি বিয়ের দলকেও জবাই করে। গ্রামবাসীরা বলেছে যে মহিলা ও শিশুরা বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা পেতে একটি শুকনো পুকুরের দিকে ছুটে যায়, কিন্তু তাতেও তারা রেহাই পায়নি, তাদের গুলি করা হয়েছিল। ২ ঘণ্টা পর আক্রমণকারীরা ও বিমানটি সেইস্থান ছেড়ে চলে যায়। রাষ্ট্রসংঘের অনুসন্ধান রিপোর্ট অনুযায়ী ২৫ জন শিশুসহ ৫২ জনকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল। পেন্টাগন সাফাই দিয়েছিল, "আমরা ওটাকে মিলিটারি টার্গেট মনে করেছিলাম।" হুবহু একই কথা পেন্টাগন বলেছিল ৩৫ বছর আগে ভিয়েতনামের মাইলাই গণহত্যার পর।

যুদ্ধে অসামরিক নাগরিকদের টার্গেট করা পশ্চিমের সাংবাদিকদের কাছে ভয়ানক খারাপ জিনিস। তাই "ওসব করে পরিচিত দানবরা, আমরা কখনও ওসব করিনা।" ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে অসামরিক ব্যক্তিদের মৃত্যু অনেক কম করে দেখানো হয়েছিল। প্রায় এক বছর পর লণ্ডনের 'মেডিক্যাল এডুকেশন ট্রাস্ট' একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষায় বলেছে, যুদ্ধ চলাকালীন ও ঠিক তার পরই অসামরিক লক্ষ্য-বস্তুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণের ঘটনায় ২ লক্ষেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এই রিপোর্টটা প্রায় উপেক্ষা করা হয়েছে। এই মাসে (জুন) 'ইরাক বডি কাউন্ট' নামে আমেরিকা ও ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ-গবেষকদের এক গোষ্ঠী বলেছেন, এবারের যুদ্ধে অন্তত ১০,০০০ ইরাকি অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে বাগদাদেই মারা গিয়েছে ২৩৫৬ জন। এই সংখ্যাটাও খুব সম্ভব নিতান্ত রয়ে সয়ে দেখানো। আফগানিস্তানেও একরকম গণহত্যা ঘটেছে। গত বছর মে মাসে জোনাথন স্টিলে মার্কিনী বোমাবর্ষণের সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অন্তত ২০,০০০ আফগান শুধু বোমাবর্ষণের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় প্রাণ হারিয়েছে, এদের মধ্যে অনেকেই মারা গিয়েছে তীব্র জলাভাবের মধ্যে ও কোন ত্রাণ না পাওয়ায়।

পর্দার আড়ালে চেপে রাখা যুদ্ধের এইসব ফলাফল একেবারেই নতুন নয়। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা দেখিয়েছে, ইতিপূর্বে ভিয়েতনামে 'এজেন্ট অরেঞ্জ' ও অন্যান্য আগাছানাশক যে পরিমাণে ছড়ানো হয়েছে বলে হিসেব দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার পরিমাণ ছিল তার চারগুণেরও বেশি। 'এজেন্ট অরেঞ্জে' আছে ডায়োক্সিন, যা পরিচিত মারণবিষগুলির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। এই এজেন্ট অরেঞ্জ স্প্রে করার দশ হাজার অভিযানে — যা প্রথমে "অপারেশন মৃতের আলয়" ও পরে "অপারেশন রানস্ হ্যাণ্ড" নামে পরিচিত, মার্কিনীরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রায় অর্ধেক বনাঞ্চল ও অসংখ্য মানুষের প্রাণ ধ্বংস করেছে। আজ পর্যন্ত গণবিধ্বংসী রাসায়নিক অস্ত্রের যত প্রয়োগ ঘটেছে, ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ভিয়েতনামে মার্কিনীদের এই বর্বর অভিযান। এই বিষের প্রভাবে ভিয়েতনামে আজও মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় বহু শিশু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিকলাঙ্গ এমনকি মৃত শিশুর জন্ম দিচ্ছে মায়েরা।

তেজষ্ক্রিয় ইউরেনিয়াম যুক্ত যুদ্ধোপকরণের ব্যবহার এজেন্ট অরেঞ্জের মতই ধ্বংসাত্মক। ১৯৯৯ সালে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন-ব্রিটিশরা ৩৫০ টন ডিপ্লিটেড (ব্যবহারের পর অবশিষ্ট বা বর্জ্য) ইউরেনিয়াম প্রয়োগ করেছে। এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষাকে ভিত্তি করে ব্রিটেনের অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটির অভিমত হল, ৫০ টন ডি ইউ শ্বাস-প্রশ্বাসের অথবা খাদ্যের সঙ্গে দেহে ঢুকলে তাতে পাঁচ লাখ মানুষ মারা যাবে। অনুমান করা হচ্ছে, সাম্প্রতিক আক্রমণে ২০০০ টন ইউরেনিয়াম বর্জ্য ব্যবহৃত হয়েছে, আর এর শিকারের অধিকাংশ হল দক্ষিণ ইরাকের সাধারণ নাগরিক।

খ্রীশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর পত্রিকার জন্য লেখা এক উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক রিপোর্টে তথ্যানুসন্ধানী সাংবাদিক স্কট পিটারসন বাগদাদের রাস্তায় পাওয়া তেজষ্ক্রিয় বুলেট ও তেজষ্ক্রিয় দূষিত ট্যাঙ্কের উল্লেখ করেছেন — যে রাস্তায় এর বিপদ সম্পর্কে অজ্ঞ শিশুরা নির্বিবাদে খেলাধুলা করে। অনেক দেরিতে কোথাও কোথাও আরবি ভাষায় সতর্কবাণী লেখা হয়েছে। এই সময়েই কানাডার ইউরেনিয়াম মেডিক্যাল রিসার্চ সেণ্টার আফগানিস্তানে দুটি সমীক্ষা করেছে — যার ফলাফলকে বলা হয়েছে 'ভয়াবহ'। এই রিপোর্ট বলছে — বোমা পড়েছে এমন প্রতিটি এলাকায় মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অসামরিক জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের মানুষের শরীরে ইউরেনিয়াম দূষণের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। ইরাকের বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছে বিলি করা একটি সরকারি ম্যাপে দেখানো হয়েছে যে, মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা শহর এলাকায় অসংখ্য ক্লাসটার বোমা ফেলেছে যার অনেকগুলি ফাটেনি। সাধারণভাবে এগুলি নজরে পড়ে না। শিশুরা খেলাচ্ছলে সেগুলো কুড়িয়ে তোলে, তারপরই সেগুলি ফাটে, পরিণাম বোঝাই যায়।

কাবুলের কেন্দ্রস্থলে জনগণকে হুঁশিয়ার করা দুটো বিজ্ঞপ্তি আমি দেখেছি, তাতে লেখা রাস্তায় এবং তাদের বাড়ির ধ্বংসস্তুপে "আমেরিকায় নির্মিত" না-ফাটা ক্লাসটার বোমা রয়েছে। এইসব বিজ্ঞপ্তি কে পড়বে? ছোট ছোট শিশুরা? যেদিন আমি শহরের মাইনপাতা এলাকায় শিশুদের লাফালাফি করে খেলতে দেখেছি সেদিনই আমার হোটেলের লবিতে টেলিভিশনের পর্দায় সি এন এন প্রোগ্রামে টনি ব্লেয়ারকেও দেখেছি। তিনি তখন ইরাকের বসরায় ছিলেন এবং তাঁর সফরের জন্য সদ্য রঙ করা একটা স্কুলে এক শিশুকে কোলে তুলে আদর করছিলেন। তাঁর সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এমন এক শহরে যেখানে ব্রিটিশ দখলদারিতে শিক্ষা, খাদ্য, ও পানীয় জলের মত পরিষেবা চূড়ান্ত বিধবস্ত অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

তিন বছর আগে, আমি এই বসরাতেই মৃত্যুপথযাত্রী শিশুদের নিয়ে একটি ফিল্ম তুলেছিলাম। নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্যান্সার চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও ঔষধ না পেয়ে শত শত শিশু সেখানে তখন অসুস্থ, নিত্য মারা যাচ্ছে। ঐ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে ছিলেন টনি ব্লেয়ার; এখন তিনিই আবার সেই শহরে জনগণের লোক না হোন, সেনাবাহিনীর একজন হয়ে ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য দেঁতো হাসি হেসে শার্টের বুক খুলে এক টলমলে শিশুকে কোলে তুলে নিচ্ছেন।

সূত্র ঃ জন পিলজার-এর 'বুশের ভিয়েতনাম' শীর্ষক রচনাটি ২২ জুন ২০০৩ তারিখে ব্রিটেনের নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ফি-বৃদ্ধির পক্ষে ওকালতি

পাঁচের পাতার পর

'বিলাতি লাট বলিয়াছেন, যাহার অর্থ নাই তাহার বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন নাই — আমাদের চোখে ইহা অতি নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়।' আজ সেই 'নিষ্ঠুর' শাসকের বা লাটের ভূমিকাতেই সত্যসাধনবাবুর এবং তাঁর দল অবতীর্ণ। এই নিষ্ঠুরতার সাফাই গাইতে গিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করে বিদ্যাসাগরের নাম যুক্ত করা অতি নিকৃষ্ট রাজনীতিরই পরিচায়ক নয় কি?

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি কে যুক্তিযুক্ত করে দেখানোর জন্য স্কুল শিক্ষামন্ত্রী এও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'যাদের পয়সা আছে তাদের ফি বাড়াও, গরিবের জন্য বিনাপয়সায় পড়ার সুযোগ থাকবে।' উচ্চশিক্ষামন্ত্রী আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ছাত্র — যে গাড়ি চড়ে আসে, তার শিক্ষার জন্য একজন গরিব চাষি কেন খরচ করবে?' কথাগুলি শুনতে ভাল, কিন্তু শুধু অন্তঃসারশূন্যই নয় — অসত্যভাষণও বটে। কারণ, 'দরিদ্র ছাত্রদের ফি দিতে হবেনা' — এই নীতি যদি সি পি এম-ফ্রণ্ট সরকার বাস্তবে গ্রহণ করত, তাহলে ইতি বৈদ্য, পবন পাঠক, সন্ধ্যা মণ্ডল সহ অগণিত ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে যে চরম সর্বনাশ নেমে এসেছে, তা ঘটত না। অথবা বাবা-মা'র আকূতি থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অভাবের জন্য বিপুল সংখ্যক যে ছাত্রছাত্রী স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে — সে ঘটনা ঘটত না। দেশে কত গরিব? কত ছাত্র দারিদ্র্যের জন্য পড়া ছেড়ে দেয়, আর স্কুলে- কলেজে- বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন ছাত্রের সব ফি মকুব করা হয় — তার তুলনামূলক তথ্য কি মন্ত্রীমহোদয়দের অজানা? আর উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের গাড়ি চড়ে' আসার দৃষ্টান্ত তাঁদের শিক্ষানীতির ফলাফলকেই স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। সত্যসাধনবাবু এবং তাঁর দল সি পি এম পরিচালিত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে তাতে গরিব ছাত্র নিচের স্তরেই ছাঁটাই হয়ে যায়। 'গাড়ি চড়ে আসা' উচ্চবিত্ত ছাড়া কারোর পক্ষেই আজ বাস্তবে উচ্চশিক্ষায় যাওয়াই সম্ভব নয়।

কিছুদিন আগে এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, উচ্চশিক্ষায় দরিদ্র পরিবারের শতকরা এক শতাংশও যেতে পারেনা। এর দায়িত্ব তো সি পি এম-ফ্রণ্ট সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। ফলে তাঁরাই দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার পথ বন্ধ করার নীতি গ্রহণ করেছেন, এবং একেবারে প্রায় শুরু থেকেই শিক্ষার সুযোগ পাওয়া এবং মেধার বিকাশকে অর্থ-নির্ভর করে তুলেছেন। আবার সেই উচ্চশিক্ষায় যারা পড়ছে তাদের কেউ গাড়ি চড়ে আসছে দেখিয়ে আরও ফি-বৃদ্ধি করার সাফাই গাইছেন। এ এক অদ্ভুত চালাকি! তাছাড়া যাদের ফি দেওয়ার ক্ষমতা আছে তারা যাদবপুরেই পড়ুক, গাড়ি চড়েই আসুক, আর হাজার টাকার টিউশন পড়ুক — তাদের আয়ের উৎসের উপর কর ধার্য করলেই কি সঠিক কাজ করা হত না? গণতান্ত্রিক রীতি মানলে সি পি এম-ফ্রণ্ট সরকার বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করত এবং যাদের বেশি সঙ্গতি রয়েছে বা আয় বেশি তাদের আয়ের উপর কর ধার্য করত। বাজার অর্থনীতির প্রশ্নকেও পুঁজিপতিশ্রেণীর মতই আরও সুকৌশলে তুলে ধরছেন তাঁরা। 'সব জিনিসের দাম বেড়েছে — ফলে এখন কি এত কম বেতনে পড়া যায়' এ প্রশ্নও অনেকে তোলেন। বাজার অর্থনীতিতে কেনাবেচা হয় পণ্যের। শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি — যুগ-সঞ্চিত মানুষের সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল — তা কার সম্পত্তি? তা বিক্রি করার নৈতিক অধিকার কার আছে? পুঁজিপতিশ্রেণীকে অথবা তাদের তাঁবেদার সরকারকে ঐ অধিকার কে দিয়েছে?

এই বাজার অর্থনীতিতে কেনা-বেচা করে তার লভ্যাংশ কার ঘরে উঠবে? যুগসঞ্চিত সংগ্রামলব্ধ এই অভিজ্ঞতা তো কারুরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় — তা সমগ্র মানবসমাজের সম্পদ। নিউটন-আইনস্টাইনের তত্ত্ব, দর্শনের ইতিহাস, সমাজবিকাশের ইতিহাসের নিয়ম, মানুষের শারীরিক গঠনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা — তার চিন্তার বিকাশের অগ্রগতির ধারা — এগুলি কি গোয়েঙ্কা, বিড়লা, টাটা বা তাদের স্বার্থরক্ষাকারী কোনও সরকারের সম্পত্তি? ফলে তা বাজারের পণ্য হিসাবে কেনা-বেচা এবং তার দ্বারা মুনাফা লোটার কোনও অধিকার সভ্যসমাজে থাকতে পারে না। মাদাম কুরী সহ সকল মহান বিজ্ঞানীর কণ্ঠেই তাই ধ্বনিত হয়েছিল — 'বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে কোন বিষয় নিয়ে যখন গবেষণা করেন, তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে সেগুলির উপর তাঁদের যে অধিকারই থাকুক, পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞান বা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর তা মানবসমাজের সম্পদ।' তাই মানবতাবাদী আন্দোলনের যুগে জ্ঞানের আদানপ্রদানটাই ছিল রীতি। এই কারণেই সে যুগে এবং নবজাগরণের সময়ে আমাদের দেশেও মানবতাবাদী চিন্তানায়করা শিক্ষার দ্বারকে সকলের জন্যই উন্মুক্ত করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষাদান ব্যবস্থা বেতন নির্ভর হলে অর্থাভাবে ক্লিষ্ট মানুষের কাছ থেকে শিক্ষার সুযোগ চলে যায় — তাই তাঁরা বিনা বেতনে শিক্ষার প্রচলনের জন্য নিরন্তর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত এও উল্লেখ্য, বুর্জোয়া-শ্রেণী তাদের অবাধ বিকাশের যুগে উৎপাদিকা শক্তির অবাধ বিকাশকেই চেয়েছিল উৎপাদনের কাজে লাগাতে। তাই উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিকাশের স্বার্থে সেদিন তারা শিক্ষারও সর্বজনীনতাকে উৎসাহিত করেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্বারা চেয়েছে অধিক সংখ্যায় দক্ষ মানুষ তৈরি করতে। কিন্তু বর্তমানে বুর্জোয়া ব্যবস্থা তীব্র সঙ্কটে নিমজ্জিত। তীব্র বাজার সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে সে আজ উৎপাদনকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। বাজার অনুযায়ী যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি সে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ চায় না। পুঁজিবাদই যে সকল সমস্যার মূলে এটা বুঝতে দিতে চায় না বলেই সে সমাজে শিক্ষার প্রসার, শিক্ষিত বেকার কমাতে চায়। শিক্ষার সীমিত সুযোগকে উচ্চবিত্তের কুক্ষিগত রাখতে চায়। এই কারণে শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব বহনের গণতান্ত্রিক রীতিকে পদদলিত করে সে শিক্ষাকে করে তুলছে ব্যয়বহুল — শিক্ষাকে মহার্ঘ পণ্যে পরিণত করতে চাইছে।

শিক্ষাকে মারার বুর্জোয়াশ্রেণীর এই চক্রান্তে আজ মার্কসবাদের আলখাল্লা পরে সি পি এম-ফ্রণ্ট সরকার সামিল হয়েছে। এই অপকর্মটিকে আড়াল করবার জন্য উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী আবার মার্কসবাদের নাম করে একটি 'তত্ত্বকথা' তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'একটা বুর্জোয়া-পুঁজিপতি-শ্রেণীর দেশের একটি রাজ্যে শিক্ষায় সমাজতন্ত্র আনা সম্ভব নয়।' প্রথমত, সত্যসাধনবাবুর দলের তাত্ত্বিক(!) বিশ্লেষণে ভারতবর্ষ 'বুর্জোয়া-পুঁজিপতিশ্রেণীর' রাষ্ট্র নয়। সে আলোচনা স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, এ প্রশ্নও মার্কসবাদে বিশ্বাসী জন-সাধারণের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই আছে যে, একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ রাজ্যে ২৬ বছর ধরে একটি 'মার্কস-বাদী' দল ক্ষমতায় টিকে আছে কার বা কাদের স্বার্থ রক্ষা করে? সে কি শোষিত মজুর-চাষী-মধ্যবিত্ত জনসাধা-রণের স্বার্থ? যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী হলে তাঁরা সরকারে বসে শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের আন্দোলনকে তীব্র করতেন। মালিক-শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তা করলে কি সত্যিসত্যিই তাঁরা এতদিন বহাল তবিয়তে গদিতে থাকতে পারতেন? আসলে ছলে-বলে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাহায্য করার দ্বারাই তাঁরা ক্ষমতায় আছেন। অবশ্য সে প্রশ্নও স্বতন্ত্র।

এখানে মূল প্রশ্ন হল, তাঁদের কাছে পশ্চিমবাংলার শিক্ষায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি কেউই জানায়নি। 'বিনা বেতনে শিক্ষাদান একমাত্র সমাজতন্ত্রেই সম্ভব' — এ জাতীয় ধারণা প্রচার কি নিছক তাঁদের মিথ্যাচার নয়? সত্যসাধনবাবু এবং তাঁর দল কি জানেন না যে, পাশ্চাত্যের বহু দেশে তো বটেই, এমনকি শ্রীলঙ্কাতে এম-এ ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক! লালা লাজপত রাই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমনকি মহাত্মা গান্ধী — এঁরা কেউই কমিউনিস্ট ছিলেন না — অথচ তাঁরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ীই শিক্ষায় বেতনের বিরোধী ছিলেন। সত্যসাধনবাবুর দলের সরকার যখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করেছিল — তখন কি পশ্চিমবাংলায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল? তা তো নয়। তাহলে আজ তারা উল্টো পথ ধরলেন কেন? সর্বশেষে বলতে হয়, কোঠারি কমিশন ষাটের দশকে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক না হয়েও ঘোষণা করেছিল, 'শিক্ষার ফি-কে রাজস্বের উৎস হিসাবে বিবেচনা করা অনুচিত।....ফি আদায়ের উপর নির্ভর না করে অন্য কোনভাবে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করা অনেক বেশি ন্যায়বিচার পূর্ণ। .... প্রাথমিক স্তর থেকে স্তরে স্তরে শিক্ষাকে টিউশন ফি মুক্ত করতে হবে। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্কুল শিক্ষা বেশিরভাগ দেশেই সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং প্রাথমিক থেকে গবেষণা স্তর পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষা অবৈতনিক।' (আর্ট ৬.১০) আর সি পি এম নিজেকে কমিউনিস্ট হিসাবে প্রচার করে স্তরে স্তরে জ্যামিতিক হারে শিক্ষার ফি-বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে, সুকৌশলে বাজার অর্থনীতির দোহাই পেড়ে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের আসন কমানোকে সত্যসাধনবাবু বিধানসভায় সমর্থন করেছেন। তাঁদের এই অপকর্মকে জনসাধারণের কাছ থেকে আড়াল করবার জন্যই তাঁরা একের পর এক মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন এবং কূটযুক্তিকে তত্ত্বের আকারে পরিবেশন করে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছেন। তবে একটা আশা এবং আনন্দের কথা যে, তাদের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা আন্দোলনে এগিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় সে আন্দোলন ব্যাপকতা পেয়েছে। তীব্র গতিবেগে সেই আন্দোলনের পথেই ফি-বৃদ্ধির এবং তার দ্বারা দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত ও তার পক্ষে যুক্তি তৈরি করার অপপ্রয়াসকে এ রাজ্যের সংগ্রামী জনগণ নিশ্চয়ই ব্যর্থ করে দেবেন এবং শিক্ষাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

রাজ্যের মোট প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা	—	৫২৩৮৫
কোন ক্লাস রুম নেই ” ”	—	১৮৩৪
(এই স্কুলগুলিকে জিরো ক্লাস রুম স্কুল বলে)		
একটি মাত্র ক্লাসরুম আছে ” ”	—	১২০৫৪
দুটি ” ” ” ” ”	—	১২৮৫
তিনটি ” ” ” ” ”	—	৬১৩৫
চারটি ” ” ” ” ”	—	৬৭৫৯
চারটির বেশি ” ” ” ”	—	৬৮৯৫

(বর্তমান, ২৯-৭-০৩)

"রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার এই করুণ ছবি মিলেছে রাজ্য সরকারেরই দেওয়া নথিপত্রে। আরও মজার ব্যাপার, শিক্ষাব্যবস্থার এই করুণ পরিস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তাদের অনেকেই ওয়াকিবহাল নন। রাজ্যে দুই হাজার প্রাইমারি স্কুলের বাড়িঘর নেই, সে খবর জানেন না বলে দাবি করেছেন রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি।" (ঐ)

রাজ্যে জুনিয়ার হাইস্কুলের সংখ্যা	—	২৩৮৩
কোন ক্লাস রুম নেই ” ”	—	৪৩
একটি মাত্র ক্লাসরুম আছে ” ”	—	৭
দুটি ” ” ” ” ”	—	১৫
তিনটি ” ” ” ” ”	—	২৮
চালা ঘরে ক্লাস চলে ” ” ”	—	১২৮

(বর্তমান পত্রিকায় উদ্ধৃত সরকারি তথ্য, ২৯-৭-০৩)

রাজ্যে হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের সংখ্যা	—	২৫১৬
৮ - ৯টি ক্লাসঘর নিয়ে ” ”	—	১০১
৬ - ৭টি ” ” ” ”	—	৫৯
৪ - ৫টি ” ” ” ”	—	৩৩
১টি ” ” ” ”	—	৩

(বর্তমান পত্রিকায় উদ্ধৃত সরকারি তথ্য, ২৯-৭-০৩)

উত্তর দিনাজপুরে ছাত্র আন্দোলনের জয়

মাধ্যমিক-পাস ছাত্ররা ডি আই-কে ঘেরাও করে নিজ নিজ এলাকার স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার দাবি আদায় করে ছাড়ল।

এ বছর রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক তুলে দেওয়ায় এবং কৈলাশ রাধারানি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি বন্ধ রাখায় ভর্তি সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। বেশ কয়েক বছর ডি এস ও আন্দোলন করে বহু ছাত্রের ভর্তির ব্যবস্থা করে দেওয়ায় এ বছরও ভর্তি হতে না পারা ঐ ছাত্ররা ডি এস ও অফিসে যোগাযোগ করে। ডি আই, ডি এম এবং এস ডি ও দপ্তরে ডি এস ও'র নেতৃত্বে বারবার বিক্ষোভ দেখানোর পরে ডি আই যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাতে দেখা যায় ঐ ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা হয়েছে প্রায় ৩০ কিমি দূরবর্তী স্কুলে। এর প্রতিবাদে ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্ররা ১ আগস্ট ডি এম দপ্তরে ডেপুটেশন দিলে তাঁর নির্দেশে ডি আই ছাত্রদের পক্ষে সুবিধাজনক স্কুলগুলিতেই তাদের ভর্তির ব্যবস্থা করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।

ছাত্র ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া

একের পাতার পর

ভাঙার জন্য আসরে নেমেছিল সি পি এম-এস এফ আই-এর একাংশ। পুলিশি আক্রমণে, সি পি এম-এস এফ আই-এর ঘৃণ্য হামলায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। ১১ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মুখে রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধতা করলেও ছাত্র পরিষদ, তৃণমূল ছাত্রপরিষদ ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করেছে। আসলে শিক্ষার সর্বস্তরে ফি-বৃদ্ধি, বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ করা পূর্বের কংগ্রেস ও বর্তমান বিজেপি সরকারের নীতি, যা এ রাজ্যে 'বামফ্রন্ট' সরকার কার্যকর করে চলেছে।

২৯ জুলাই ছাত্র ধর্মঘটের দিন পুলিশ-সি পি এম-এস এফ আই-এর আক্রমণে রক্তাক্ত, আহত হয় বহু এ আই ডি এস ও কর্মী। **কলকাতার** মৌলানা আজাদ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শামসুল আলমকে কলেজ গেট থেকে দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে যায় কলেজের ইউনিয়ন রুমে। লাঠি, রড, বেল্ট দিয়ে মারতে মারতে তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রাখে। এরপর ঐ গুণ্ডাবাহিনী রক্তাক্ত শামসুলের রক্ত নিজেদের গায়ে মেখে মিথ্যা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পুলিশের কাছে ডি এস ও'র বিরুদ্ধে ডায়েরি করে। এস এফ আই হিটলারি কায়দায় প্রচার করতে থাকে যে, শামসুলই তাদের মেরেছে। মৃতপ্রায় শামসুলকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। **উত্তর ২৪ পরগণা** জেলার বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজে পিকেটিং করার সময় ডি এস ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি স্বপন মণ্ডল, সম্পাদক চঞ্চল ঘোষ, বিকাশ দাস, রিণ্টু মণ্ডলকে এস এফ আই কর্মীরা প্রচণ্ড মারধর করে। রিণ্টু মণ্ডল রক্ত বমি করতে থাকলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এস এফ আই দুষ্কৃতীরা এমনকি এ আই ডি এস ও'র ছাত্রী কর্মীদের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করেনি। মোট দশজন এ আই ডি এস ও কর্মী এর ফলে আহত হয়। **শিলিগুড়ি** ফাঁসিদেওয়া, ফুলবাড়ি, শিবমন্দির সহ সর্বত্র স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। শিলিগুড়ি কলেজে এস এফ আই-এর হামলায় ৩ জন আহত হয়। গুরুতর আহত সীমা তরফদারকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

কোথাও কোথাও ছাত্র ধর্মঘট ভাঙতে সরাসরি আসরে নেমেছিল সি পি এম এর একাংশ। তাদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছে **কোচবিহারের** ডি এস ও জেলা সম্পাদক কমরেড গৌরাঙ্গ দেবনাথ। তাকে কোচবিহার হাসপাতালে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করতে হয়। একই চিত্র দেখা যায় মাথাভাঙায়। আহত কমরেড লক্ষ্মণ রায়কে মাথাভাঙা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কোচবিহারে সি পি এম-এর আক্রমণে আহত হয় গৌর ইশোর, সুমন পণ্ডিত, কমল বর্মণ। **মেদিনীপুর শহরে** সকালেই পুলিশ এ আই ডি এস ও সংগঠক অনিন্দিতা জানা, দীপক পাত্র, শিউলি মান্না, বুলবুল ধাড়াকে গ্রেপ্তার করে। খড়্গপুরে এ আই ডি এস ও সংগঠক কুমারেশ দে, শিবম্ চ্যাটার্জীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বীভৎসভাবে মেরেছে এবং এ আই ডি এস ও'র ব্যানার, ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে দিয়েছে। ঝাড়গ্রামে সি পি এম-এর আক্রমণে মৌসুমী বেরা, অনীতা দাস, প্রদীপ ওঝা সহ ৫ জন আহত হয়েছে। গুরুতর আহত প্রদীপ ওঝাকে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেলদা কলেজে এস এফ আই-এর হামলায় বাপ্পাদিত্য দে, শ্যামাপদ মণ্ডল, মনোরঞ্জন মণ্ডল গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে। এছাড়াও আরও ২ জন আহত। সবং-এ ৫ জন, পিংলায় বিষ্ণু রাজ সহ ২ জন, মেচেদায় তাপস সামন্ত আহত। এগরায় ৪টি স্কুলে সি পি এম ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করলে ছাত্র-অভিভাবকরা রুখে দাঁড়ায়। **কলকাতায়ও** বিভিন্ন জায়গায় সি পি এম-এস এফ আই সরাসরি এ আই ডি এস ও কর্মীদের উপর হামলা চালায়। বেহালায় কিশোরভারতী স্কুলে এস এফ আই-এর হামলায় একজন ছাত্রী সহ নয়জন আহত হয়। ধর্মঘটের স্বতঃস্ফূর্ততায় ক্ষিপ্ত এস এফ আই গার্ডেনরিচের নুটবিহারী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (বালক ও বালিকা), মুদিয়ালি বয়েজে ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীদের মারধর করে। দমদমের শিশুভারতী স্কুলে জনৈক সি পি এম নেতা ধর্মঘটী ছাত্রদের মারতে থাকলে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ করেন। ছাত্র ধর্মঘট সর্বাত্মক হয়। বরানগরের অশোকগড় স্কুলে পিকেটিং চলাকালীন সি পি এম হামলা করে এবং এ আই ডি এস ও সংগঠক কমরেড শ্যামলী করের সাথে অশালীন আচরণ করে। **যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে** ছাত্র ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। এস এফ আই জোর করে ক্লাস করানোর চেষ্টা করলেও ছাত্রছাত্রীরা তা প্রত্যাখ্যান করে ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। **বীরভূম** জেলার বোলপুরের শ্রীনন্দা হাইস্কুল ও মুরারই গার্লস হাইস্কুলে পুলিশ দিয়ে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করলেও ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট করে এবং লাভপুরে যাদবলাল হাইস্কুলে সি পি এম ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করলে ছাত্রদের সম্মিলিত প্রতিরোধে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং ছাত্ররা শহরে মিছিল করে। **হুগলির** শ্রীরামপুর গার্লস কলেজে ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রী সংসদের পিকেটিং চলাকালীন অভিভাবকের ছদ্মবেশে কিছু সি পি এম-এর লোক মেয়েদের ধাক্কা মেরে জোর করে ধর্মঘট ভাঙতে চায়। টিচার-ইনচার্জ এই অভব্য আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে সি পি এম-এর লোকেদের কলেজ থেকে বের করে দেন। ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট পালন করে। চুচুঁড়া কলেজিয়েট স্কুলে এস এফ আই জোর করে ২০ জন ছাত্রকে ঢোকালেও ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্ররা ধর্মঘট করেছে। **জলপাইগুড়ির** রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি শহর থেকে ধর্মঘটের প্রচার চলাকালীন বিপুল রায়, কৌশিক রায়, মনোজ রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। **মুর্শিদাবাদ জেলায়ও** ছাত্রধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। বহরমপুরের কে এন কলেজে ছাত্র পরিষদ ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। ইসলামপুর থেকে ছাত্র সংগঠক রবিউল ইসলামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রাণীনগরে ধর্মঘট ভাঙার জন্য স্কুল গেটে প্রশাসন পুলিশ নিয়োগ করে। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে। সি পি এম কর্মীরা সানারপাড়া হাইস্কুলে চারজনকে মারধর করে। জলঙ্গী গার্লস স্কুলে ধর্মঘট ভাঙার জন্য এস এফ আই কয়েকজন ছাত্রীকে জোর করে ঢুকিয়েছে। জলঙ্গী হাইস্কুলে সি পি এম-এর লোকেরা আটজন ছাত্রকে মেরেছে এবং তাদের নামে স্কুলে ভাঙচুরের অভিযোগ করে এফ আই আর করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও স্কুলগুলিতে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে। **দক্ষিণ ২৪ পরগণায়** ছাত্র ধর্মঘট ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কাকদ্বীপ স্কুলে এস এফ আই-এর আক্রমণে বিশ্বজিৎ মাঝি আহত হয়েছে। **পুরুলিয়ায়** অভূতপূর্ব ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। মাতৃভাষায় প্রশ্নপত্রের দাবিতে জেলার উর্দু মাধ্যম স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীরা এদিন ধর্মঘট করে। ক্ষিপ্ত এস এফ আই কর্মীরা রঘুনাথপুর কলেজে এ আই ডি এস ও কর্মীদের মেরেছে। ঝালদার বেগুনকোদর হাইস্কুলে কংগ্রেস এ আই ডি এস ও কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। শহরের জে কে ও নিস্তারিণী কলেজের বন্ধ দরজা পুলিশ এসে খুলে দিলেও ছাত্ররা আবার তা বন্ধ করে দেয়। রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই পরিকল্পনামাফিক সি পি এম-এস এফ আই হামলা চালালেও ছাত্র ধর্মঘট তারা ভাঙতে পারেনি।

নানান জায়গায় পুলিশী সন্ত্রাস, সি পি এম-এস এফ আই-এর হামলা সত্ত্বেও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সহ সাধারণ মানুষ যাঁরা ছাত্র ধর্মঘটে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মহীউদ্দিন মান্নান আগামী ১৩ আগস্ট কলকাতায় ছাত্র-যুব সমাবেশ সফল করার জন্য আবেদন করেছেন।

গৌরাঙ্গ দেবনাথ, কোচবিহার

শামসুল আলম, কলকাতা

সীমা তরফদার, শিলিগুড়ি

এস ইউ সি আই-এর অভিনন্দন

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন —

"রাজ্য সরকার কর্তৃক শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ, অত্যধিক ফি ও ডোনেশান বৃদ্ধি, ক্যাপিটেশন প্রথা চালু এবং তীব্র ভর্তি সঙ্কট ইত্যাদির বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিভিন্ন জেলায় ধর্মঘট ভাঙার হীন উদ্দেশ্যে ডি এস ও কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের উপর ব্যাপক হামলা করার জন্য সি পি আই (এম) যেভাবে এস এফ আই কর্মীদের একাংশ, সমাজবিরোধী ও পুলিশকে ব্যবহার করে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীকে গুরুতর আহত করেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি।

শিক্ষা সংহারক নীতি প্রত্যাহার করে ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলো মেনে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি।"

স্বাস্থ্যনীতি ও চিকিৎসা শিল্পের বাজার প্রসঙ্গে

তিনের পাতার পর

বিজ্ঞানসাধককে তারা রূপান্তরিত করেছে তাদের বেতনভুক শ্রমিকে। ... উৎপাদনে প্রতিনিয়ত বৈপ্লবিক রূপান্তর, নিরবচ্ছিন্নভাবে সমস্ত সামাজিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এব) চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা বুর্জোয়া যুগকে পূর্ববর্তী সমস্ত যুগ থেকে পৃথক করেছে।" এই সত্যই আজ জলের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

তাই বলতেই হবে রোগী হোক, ডাক্তার হোক, চিকিৎসার শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেটিং হোক — চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলতার হাত থেকে রেহাই নেই। যতক্ষণ পুঁজিবাদ টিকে থাকছে।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী উদ্বোধন অনুষ্ঠান ২ আগস্ট মহাবোধি সোসাইটি হলে। (ইনসেটে) উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী লালসেলাম

একের পাতার পর

করেছিলেন। গণআন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে তিনি একাধিকবার কারারুদ্ধ হন।

১৯৮৮ সালে দলের প্রথম সর্বভারতীয় কংগ্রেসের আগে, ১৯৮৭ সালে তাঁকে স্টাফ মেম্বার করা হয়। ১৯৮৮-র কংগ্রেসের আগে বিহার রাজ্য সম্মেলনে তিনি রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে পাটনায় রাজ্য অফিস থেকেই তিনি পার্টির কাজকর্ম পরিচালনা করতেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় ও আদর্শে সংগঠনকে গড়ে তোলার জন্য শুরুর দিন থেকেই তিনি অবিচলভাবে কঠিন ও কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। কমরেড ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী যৌথভাবে কাজ করতে ও চলতে গিয়ে কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি অর্জন করেছিলেন, যার জন্য তিনি সমস্ত কমরেডের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন। এমনকি কাজকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে কারোর সাথে মতবিরোধ দেখা দিলেও সেই কমরেডদের সঙ্গে হাসিমুখে ও খোলামনে কাজ করার দ্বারা তিনি তাদের জয় করতে পারতেন। কৌতুকপ্রিয় ও রসিক ছিলেন বলে কখনও কর্মীদের মন ভারাক্রান্ত হতে দিতেন না, একটা প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখতেন। বিরোধিতা কখনও তিক্ততায় পর্যবসিত হতে দিতেন না। কখনও ব্যক্তিগত কারণে অন্যকে আঘাত দেননি তো বটেই, বরং আঘাত পেলেও তা হাসিমুখে সকৌতুকে সহ্য করেছেন। তাঁর চরিত্রের এইসব দিক অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর মৃত্যুতে দল হারালো একজন আমৃত্যু বিপ্লবীকে, যে ক্ষতি পূরণ করা এক কঠিন সংগ্রাম।

মৃত্যুসংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় কেন্দ্রীয় পার্টি অফিসে এবং পাটনায় রাজ্য পার্টি অফিস সহ বিহারের সমস্ত পার্টি অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যাণ্ড হসপিটালে তাঁর মরদেহে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পক্ষে এবং নিজের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের পক্ষে এবং নিজের পক্ষে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। উপস্থিত স্টাফ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড মানিক মুখার্জী এবং কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর আত্মীয়স্বজনরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এ আই এম এস এস-এর সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী, পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড সাধনা চৌধুরী, গণদাবী পত্রিকার পক্ষে কমরেড সলিল চক্রবর্তী, পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসের পক্ষে কমরেড স্বপন বসু ও এ আই ডি এস ও'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায়।

আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনদিন কালো ব্যাজ পরিধান করে তাঁর স্মরণে শোক পালন করা হবে এবং ৬ আগস্ট পাটনায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

রাজনৈতিক দল-শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের আঁতাত আরও জোরদার হবে

গত ৩০ জুলাই লোকসভায় পাশ হওয়া নির্বাচন ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য আইন (সংশোধনী) প্রসঙ্গে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন যে, বৃহৎ শিল্পপতি-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি ও নানা ব্যক্তি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে হিসাববহির্ভূত যে বিপুল অঙ্কের টাকা দিয়ে থাকে, তা নিয়ন্ত্রণ করার প্রগতিশীল তক্‌মা লাগিয়ে যে বিল লোকসভায় পাশ করা হল, তা বাস্তবে এই প্রক্রিয়াকে কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে তো পারবেই না, বরং এই আইনী অনুমোদন বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কালো টাকাকে সাদা করার সুযোগ করে দিয়ে বুর্জোয়া দলগুলিকে ইচ্ছামতো অঢেল টাকা দিয়ে যেতেই তাদের আরও সাহায্য করবে।

আমাদের দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই যে পুঁজিপতিশ্রেণী অর্থ ও পেশীশক্তির জোরে নিয়ন্ত্রণ করে, সেকথা জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কমরেড নীহার মুখার্জী এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজনের দিকটি তুলে ধরেন।

হরিয়ানা বিধানসভায় পাশ করা আইন প্রত্যাহারের দাবি

দুটির বেশি সন্তান থাকলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবেনা — এই মর্মে হরিয়ানা বিধানসভায় যে আইনটি সম্প্রতি পাশ করা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট যাতে সম্মতি দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি ৪ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেছে, এই আইন জনগণের মৌলিক অধিকারকে লংঘন করেছে এবং দেশের বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে এই আইনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে দরিদ্র অংশের জনগণকেই পঞ্চায়েত নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে বিতাড়ন করা হবে। এখনই এই আইন প্রত্যাহারে বাধ্য না করা হলে, অন্যান্য রাজ্যও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে এবং শেষ পর্যন্ত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনেও এমন শর্ত আনার জন্য লোকসভাতেও অনুরূপ আইন করা হবে।

তাই কেন্দ্রীয় কমিটি অবিলম্বে এই আইন প্রত্যাহারের দাবি করেছে। এই চরম জনবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি হরিয়ানার তথা সমগ্র দেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পিটিশনস্‌ কমিটি হিন্দিমাধ্যম ছাত্রদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দি প্রশ্নপত্রের দাবি সমর্থন করে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে। এই পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গাল ছাত্র সংঘর্ষ কমিটি গত ১ আগস্ট কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকার এখনই দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নেবে বলে জানিয়েছে।

বিদ্যুতের মাশুল, শিক্ষায় ফি ও হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধি, জমির বাড়তি খাজনা ও সেস, বর্ধিত পরিবহণ ভাড়া প্রভৃতি প্রত্যাহার এবং শ্রমিক ছাঁটাই, লেঅফ-লকআউট বন্ধ করা, চটশিল্পের কালাচুক্তি বাতিল করা ও অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে

এস ইউ সি আই-এর ডাকে

২১ আগস্ট

বাংলা বনধ

সফল করুন

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net